আর্ রা'দ

১৩

নামকরণ

তের নম্বর আয়াতের وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلٰئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ বাক্যাংশের "আর্ রা'দ" শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এ নামকরণের মানে এ নয় যে, এ সূরায় রা'দ অর্থাৎ মেঘগর্জনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বরং এটা শুধু আলামত হিসেবে একথা প্রকাশ করে যে, এ সূরায় "রাদ" উল্লেখিত হয়েছে বা "রা'দ"–এর কথা বলা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

৪ ও ৬ রুকূ'র বিষয়বস্তু সাক্ষ দিচ্ছে, এ সূরাটিও সূরা ইউনূস, হূদ ও আ'রাফের সমসময়ে নাযিল হয়। অর্থাৎ মক্কায় অবস্থানের শেষ যুগে। বর্ণনাভংগী থেকে পরিষ্কার প্রতীয়মান হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাওয়াত শুরু করার পর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ে গেছে। বিরোধী পক্ষ তাঁকে লাঞ্ছিত করার এবং তাঁর মিশনকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে থাকে। মুমিনরা বারবার এ আকাংখা পোষণ করতে থাকে, হায়! যদি কোনপ্রকার অলৌকিক কাণ্ড–কারখানার মাধ্যমে এ লোকগুলোকে সত্য সরল পথে আনা যায়। অন্যদিকে আল্লাহ মুসলমানদেরকে এ মর্মে বুঝাচ্ছেন যে, ঈমানের পথ দেখাবার এ পদ্ধতি আমার এখানে প্রচলিত নেই আর যদি ইসলামের শত্রুদের রশি ঢিলে করে দেয়া হয়ে থাকে তাহলে এটা এমন কোন ব্যাপার নয় যার ফলে তোমরা ভয় পেয়ে যাবে। তারপর ৩১ আয়াত থেকে জানা যায়, বার বার কাফেরদের হঠকারিতার এমন প্রকাশ ঘটেছে যারপর ন্যায়সংগতভাবে একথা বলা যায় যে, যদি কবর থেকে মৃত ব্যক্তিরাও উঠে আসেন তাহলেও এরা মেনে নেবে না বরং এ ঘটনার কোন না কোন ব্যাখ্যা করে নেবে। এসব কথা থেকে অনুমান করা যায় যে, এ সূরাটি মক্কার শেষ যুগে নাযিল হয়ে থাকবে।

কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু

সূরার মূল বক্তব্য প্রথম আয়াতেই বলে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা কিছু পেশ করছেন তাই সত্য কিন্তু এ লোকেরা তা মেনে নিচ্ছে না, এটা এদের ভুল। এ বক্তব্যই সমগ্র ভাষণটির কেন্দ্রীয় বিষয়। এ প্রসংগে বার বার বিভিন্ন পদ্ধতিতে তাওহীদ, রিসালাত ও পরকালের সত্যতা প্রমাণ করা হয়েছে। এগুলোর

প্রতি ঈমান আনার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ফায়দা বুঝানো হয়েছে। এগুলো অস্বীকার করার ক্ষতি জানিয়ে দেয়া হয়েছে। এ সংগে একথা মনের মধ্যে গেঁথে দেয়া হয়েছে যে, কুফরী আসলে পুরোপুরি একটি নির্বুদ্ধিতা ও মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তারপর এ সমগ্র বর্ণনাটির উদ্দেশ্য শুধুমাত্র বুদ্ধি-বিবেককে দীক্ষিত করা নয় বরং মনকে ঈমানের দিকে আকৃষ্ট করাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য। তাই নিছক বুদ্ধিবৃত্তিক দলীল-প্রমাণ পেশ করেই শেষ করে দেয়া হয়নি, এ সংগে এক একটি দলীল ও এক একটি প্রমাণ পেশ করার পর থেমে গিয়ে নানা প্রকার ভীতি প্রদর্শন, উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি এবং স্নেহপূর্ণ ও সহানুভূতিশীল উপদেশ প্রদানের মাধ্যমে অজ্ঞ লোকদের নিজেদের বিভ্রান্তিকর হঠকারিতা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে।

ভাষণের মাঝখানে বিভিন্ন জায়গায় বিরোধীদের আপত্তিসমূহের উল্লেখ না করেই তার জবাব দেয়া হয়েছে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের ব্যাপারে লোকদের মনে যেসব সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল অথবা বিরোধীদের পক্ষ থেকে সৃষ্টি করা হচ্ছিল সেগুলো দূর করা হয়েছে। এ সংগে মুমিনরা কয়েক বছরের দীর্ঘ ও কঠিন সংগ্রামের কারণে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ছিল এবং অস্থির চিত্তে অদৃশ্য সাহায্যের প্রতীক্ষা করছিল, তাই তাদেরকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে।

الٓمّٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ ۗ وَالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ① اَللّٰهُ الَّذِيْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۗ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاۤءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ ②

আলিফ লাম মীম র। এগুলো আল্লাহর কিতাবের আয়াত। আর তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যাকিছু নাযিল হয়েছে তা প্রকৃত সত্য কিন্তু (তোমার কওমের) অধিকাংশ লোক তা বিশ্বাস করে না।[১]

আল্লাহই আকাশসমূহ স্থাপন করেছেন এমন কোন স্তম্ভ ছাড়াই যা তোমরা দেখতে পাও।[২] তারপর তিনি নিজের শাসন কর্তৃত্বের আসনে সমাসীন হয়েছেন।[৩] আর তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে একটি আইনের অধীন করেছেন।[৪] এ সমগ্র ব্যবস্থার প্রত্যেকটি জিনিস একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলে।[৫] আল্লাহই এ সমস্ত কাজের ব্যবস্থাপনা করছেন। তিনি নিদর্শনাবলী খুলে খুলে বর্ণনা করেন,[৬] সম্ভবত তোমরা নিজেদের রবের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারটি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করবে।[৭]

১. এটাই এ সূরার ভূমিকা। এখানে মাত্র কয়েকটি শব্দে সমগ্র বক্তব্যের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। বক্তব্যের লক্ষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁকে সম্বোধন করে মহান আল্লাহ বলছেন ঃ হে নবী! তোমার সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক এ শিক্ষা গ্রহণ করতে অস্বীকার করছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি এটা তোমার প্রতি নাযিল করেছি এবং লোকেরা মানুক বা না মানুক এটাই সত্য। এ সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর মূল ভাষণ শুরু হয়ে গেছে। তাতে অস্বীকারকারীদেরকে এ শিক্ষা সত্য কেন এবং এর ব্যাপারে তাদের নীতি কতটুকু ভুল—একথা বুঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। এ ভাষণটি বুঝতে হলে শুরুতেই এ

বিষয়টি সামনে থাকা প্রয়োজন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে সময় যে জিনিসটির দিকে লোকদেরকে দাওয়াত দিচ্ছিলেন তা তিনটি মৌলিক বিষয় সমন্বিত ছিল। এক, প্রভুত্বের কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য নির্ধারিত। এ কারণে তিনি ছাড়া আর কেউ ইবাদাত ও বন্দেগী লাভের যোগ্য নয়। দুই, এ জীবনের পরে আর একটি জীবন আছে। সেখানে তোমাদের নিজেদের যাবতীয় কার্যক্রমের জবাবদিহি করতে হবে। তিন, আমি আল্লাহর রসূল এবং আমি যা কিছু পেশ করছি নিজের পক্ষ থেকে নয় বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে পেশ করছি। এ তিনটি মৌলিক কথা মানতে লোকেরা অস্বীকার করছিল। এ কথাগুলোকেই এ ভাষণের মধ্যে বার বার বিভিন্ন পদ্ধতিতে বুঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে এবং এগুলো সম্পর্কে লোকদের সন্দেহ ও আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে।

২. অন্য কথায় আকাশসমূহকে অদৃশ্য ও অননুভূত স্তম্ভসমূহের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আপাতদৃষ্টে মহাশূন্যে এমন কোন জিনিস নেই, যা এ সীমাহীন মহাকাশ ও নক্ষত্র জগতকে ধরে রেখেছে। কিন্তু একটি অননুভূত শক্তি তাদের প্রত্যেককে তার নিজের স্থানে ও আবর্তন পথের ওপর আটকে রেখেছে এবং মহাকাশের এ বিশাল বিশাল নক্ষত্রগুলোকে পৃথিবীপৃষ্ঠে বা তাদের পরস্পরের ওপর পড়ে যেতে দিচ্ছে না।

৩. এর ব্যাখ্যার জন্য সূরা আ'রাফের ৪১ টীকা দেখুন। তবে সংক্ষেপে এখানে এতটুকু ইশারা যথেষ্ট মনে করি যে, আরশের (অর্থাৎ বিশ্ব-জাহানের শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রস্থল) ওপর আল্লাহর সমাসীন হবার ব্যাপারটি একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে কুরআনে বিভিন্ন স্থানে উল্লেখিত হয়েছে। সে উদ্দেশ্যটি হচ্ছে এই যে, আল্লাহ এ বিশ্ব-জাহানকে কেবল সৃষ্টিই করেননি বরং তিনি নিজেই এ রাজ্যের শাসন কর্তৃত্ব পরিচালনা করছেন। এ সুবিশাল জগতটি এমন কোন কারখানা নয়, যা নিজে নিজেই চলছে, যেমন অনেক মূর্খ ও অজ্ঞ লোক ধারণা করে থাকে। আর এ প্রাকৃতিক জগতটি বহু ইলাহর বিচরণক্ষেত্র নয়, অন্য এক দল অজ্ঞ ও মূর্খ যেমনটি মনে করে বসে আছে বরং এটি একটি নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং এর সৃষ্টিকর্তা নিজেই এ ব্যবস্থা পরিচালনা করছেন।

৪. এখানে এ বিষয়টি সামনে রাখতে হবে যে, এমন এক কওমকে এখানে সম্বোধন করা হচ্ছে যারা আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করতো না, তিনি যে সবকিছুর স্রষ্টা তাও অস্বীকার করতো না এবং এখানে যেসব কাজের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ সেগুলোর কর্তা এ ধারণাও পোষণ করতো না। তাই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই যে এ আকাশসমূহ স্থাপন করেছেন এবং তিনিই চন্দ্র ও সূর্যকে একটি নিয়মের অধীন করেছেন, একথার সপক্ষে যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনের প্রয়োজন বোধ করা হয়নি। বরং যেহেতু শ্রোতা নিজে এ সত্যগুলোর বিশ্বাস করতো, তাই এগুলোকে অন্য একটি মহাসত্যের জন্য যুক্তি হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে। সে মহাসত্যটি হচ্ছে, আল্লাহ ছাড়া মাবুদ গণ্য হবার অধিকার রাখে এমন দ্বিতীয় কোন সত্তা এ বিশ্ব ব্যবস্থায় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী নয়। প্রশ্ন দেখা দিতে পারে, যে ব্যক্তি আল্লাহর অস্তিত্বই মানে না এবং তিনি যে বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা ও শাসনকর্তা সে কথা একেবারেই অস্বীকার করে তার মোকাবিলায় এ যুক্তি কেমন করে কার্যকর হতে পারে? এর জবাবে বলা যায়, মুশরিকদের মোকাবিলায় তাওহীদকে প্রমাণ করার জন্য আল্লাহ যেসব যুক্তি দেন নাস্তিকদের মোকাবিলায় আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য সেই একই যুক্তি যথেষ্ট। তাওহীদের সমস্ত যুক্তির ভিত্তিভূমি

হচ্ছে এই যে, পৃথিবী থেকে নিয়ে আকাশ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ব–জাহান একটি পূর্ণাংগ কারখানা এবং এ সমগ্র কারখানাটি চলছে একটি মহাপরাক্রান্ত শক্তির অধীনে। এর মধ্যে সর্বত্র একটি সার্বভৌম কর্তৃত্ব, একটি নিখুঁত প্রজ্ঞা ও নির্ভুল জ্ঞানের লক্ষণ প্রতিভাত। এ লক্ষণ ও চিহ্নগুলো যেমন একথা প্রকাশ করে যে, এ ব্যবস্থার বহু পরিচালক নেই তেমনি একথাও প্রকাশ করে যে, এ ব্যবস্থার একজন পরিচালক অবশ্যই রয়েছেন। প্রতিষ্ঠান থাকবে অথচ তার পরিচালক থাকবে না, আইন থাকবে অথচ শাসক থাকবে না, প্রজ্ঞা নৈপুণ্য ও দক্ষতা বিরাজ করবে অথচ কোন প্রাজ্ঞ, দক্ষ ও নিপুণ সত্তা থাকবে না, জ্ঞান থাকবে অথচ জ্ঞানী থাকবে না, সর্বোপরি সৃষ্টি থাকবে অথচ তার স্রষ্টা থাকবে না–এমন উদ্ভট ধারণা কেবল সেই ব্যক্তিই করতে পারে যে চরম হঠকারী ও গোঁয়ার অথবা যার বুদ্ধি বিভ্রম ঘটেছে।

৫. অর্থাৎ এ অবস্থা কেবল মাত্র একথার সাক্ষ্য দিচ্ছে না যে, সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন এক সত্তা এর ওপর শাসন কর্তৃত্ব চালাচ্ছে এবং একটি প্রচণ্ড শক্তিশালী প্রজ্ঞা এর মধ্যে কাজ করছে বরং এর সমস্ত অংশ এবং এর মধ্যে কর্মরত সমস্ত শক্তিই এ সাক্ষও দিচ্ছে যে, এর কোন জিনিসই স্থায়ী নয়। প্রত্যেকটি জিনিসের জন্য একটি সময় নির্ধারিত রয়েছে। সেই সময় শেষ হওয়া পর্যন্ত তা চলতে থাকে এবং সময় শেষ হয়ে গেলে খতম হয়ে যায়। এ সত্যটি যেমন এ কারখানার প্রত্যেকটি অংশের ব্যাপারে সঠিক তেমনি সমগ্র কারখানা বা স্থাপনাটির ব্যাপারেও সঠিক। এ প্রাকৃতিক ব্যবস্থার সামগ্রিক কাঠামো জানিয়ে দিচ্ছে যে, এটি চিরন্তন ব্যবস্থা নয়, এর জন্যও কোন সময় অবশ্যি নির্ধারিত রয়েছে, যখন এ সময় খতম হয়ে যাবে তখন এর জায়গায় আর একটি জগত শুরু হয়ে যাবে। কাজেই যে কিয়ামতের আসার খবর দেয়া হয়েছে তার আসাটা অসম্ভব নয় বরং না আসাটাই অসম্ভব।

৬. অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব সত্যের খবর দিচ্ছেন সেগুলোর যথার্থতা ও সত্যতা নিরূপক নিদর্শনাবলী। বিশ্ব–জাহানের সর্বত্র সেগুলোর পক্ষে সাক্ষ দেবার মতো নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে। লোকেরা চোখ খুলে দেখলে দেখতে পাবে যে, কুরআনে যেসব বিষয়ের প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দেয়া হয়েছে, পৃথিবী ও আকাশে ছড়ানো অসংখ্য নিদর্শন সেগুলোর সত্যতা প্রমাণ করছে।

৭. ওপরে বিশ্ব–জাহানের যে নিদর্শনাবলীকে সাক্ষী হিসেবে পেশ করা হয়েছে তাদের এ সাক্ষ তো একেবারেই সুস্পষ্ট যে, এ বিশ্ব–জাহানের স্রষ্টা ও পরিচালক একজনই কিন্তু মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবন, আল্লাহর আদালতে মানুষের হাযির হওয়া এবং পুরস্কার ও শাস্তি সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব খবর দিয়েছেন সেগুলোর সত্যতার সাক্ষও এ নিদর্শনগুলোই দিচ্ছে। তবে এ সাক্ষ একটু অস্পষ্ট এবং সামান্য চিন্তা–ভাবনা করলে বোধগম্য হয়। তাই প্রথম সত্যটির ব্যাপারে সজাগ করে দেবার প্রয়োজনবোধ করা হয়নি। কারণ শ্রোতা শুধুমাত্র যুক্তি শুনেই বুঝতে পারে, এ থেকে কি কথা প্রমাণ হয়। তবে দ্বিতীয় সত্যটির ব্যাপারে বিশেষভাবে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। কারণ এ নিদর্শনগুলো সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করলেই নিজের রবের দরবারে হাযির হবার ব্যাপারটির ওপর বিশ্বাস জন্মাতে পারে।

উপরোক্ত নিদর্শনগুলো থেকে আখেরাতের প্রমাণ দু'ভাবে পাওয়া যায় ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْهٰرًا ۖ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ ۖ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝ وَفِى الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ ۙ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِى الْاُكُلِ ۖ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝

আর তিনিই এ ভূতলকে বিছিয়ে রেখেছেন, এর মধ্যে পাহাড়ের খুটি গেড়ে দিয়েছেন এবং নদী প্রবাহিত করেছেন। তিনিই সব রকম ফল সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায় এবং তিনিই দিনকে রাত দিয়ে ঢেকে ফেলেন।[৮] এ সমস্ত জিনিসের মধ্যে বহুতর নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তা–ভাবনা করে।

আর দেখো, পৃথিবীতে রয়েছে পরস্পর সংলগ্ন আলাদা আলাদা ভূখণ্ড,[৯] রয়েছে আংগুর বাগান, শস্যক্ষেত, খেজুর গাছ—কিছু একাধিক কাণ্ডবিশিষ্ট আবার কিছু এক কাণ্ডবিশিষ্ট,[১০] সবই সিঞ্চিত একই পানিতে কিন্তু স্বাদের ক্ষেত্রে আমি করে দেই তাদের কোনটাকে বেশী ভালো এবং কোনটাকে কম ভালো। এসব জিনিসের মধ্যে যারা বুদ্ধিকে কাজে লাগায় তাদের জন্য রয়েছে বহুতর নিদর্শন।[১১]

এক ঃ যখন আমরা আকাশমণ্ডলীর গঠনাকৃতি এবং চন্দ্র ও সূর্যকে একটি নিয়মের অধীনে পরিচালনা করার বিষয়টি নিয়ে চিন্তা–ভাবনা করি তখনই আমাদের মন সাক্ষ দেয় যে, আল্লাহ এ বিশাল জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন এবং যাঁর অসীম শক্তি এ বিরাট বিরাট গ্রহ–নক্ষত্রকে মহাশূন্যে আবর্তিত করছে তাঁর পক্ষে মানব জাতিকে মৃত্যুর পর পুনর্বার সৃষ্টি করা মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়।

দুই ঃ এ মহাশূন্য ব্যবস্থা থেকে আমরা একথারও সাক্ষ লাভ করি যে, এর স্রষ্টা একজন সর্বজ্ঞ এ পরিপূর্ণ জ্ঞানবান সত্তা। তিনি মানব জাতিকে বুদ্ধিমান সচেতন এবং স্বাধীন চিন্তা ও কর্ম শক্তি সম্পন্ন সৃষ্টি হিসেবে তৈরী করার এবং নিজের যমীনের অসংখ্য বস্তুনিচয়ের ওপর তাদেরকে কর্তৃত্ব ক্ষমতা দান করার পর তাদের জীবনকালের বিভিন্ন কাজের হিসেব নেবেন না, তাদের মধ্যে যারা জালেম তাদেরকে জুলুম–অত্যাচারের জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না এবং মজলুমদের ফরিয়াদ শুনবেন না, তাদের সৎলোকদেরকে সৎকাজের পুরস্কার এবং অসৎলোকদেরকে অসৎকাজের জন্য শাস্তি দেবেন না এবং

তাদেরকে কখনো একথা জিজ্ঞেসই করবেন না যে, আমি তোমাদের হাতে যে মূল্যবান আমানত সোপর্দ করেছিলাম তাকে তোমরা কিভাবে ব্যবহার করেছো—একথা তাঁর পূর্ণজ্ঞান ও প্রজ্ঞার কারণে কখনো কল্পনাই করা যায় না। একজন অন্ধ ও কাণ্ডজ্ঞানহীন রাজা অবশ্যি নিজের রাজ্যের যাবতীয় কাজ-কারবার নিজের কর্মচারীদের হাতে সোপর্দ করে দিয়ে নিজের দায়িত্বের ব্যাপারে গাফেল হয়ে যেতে পারেন কিন্তু একজন জ্ঞানী ও সচেতন রাজার কাছ থেকে কখনো এ ধরনের ভ্রান্তি, অসতর্কতা ও গাফলতি আশা করা যেতে পারে না।

আকাশ সম্পর্কে এ ধরনের পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের ফলে পরকালীণ জীবন যে সম্ভবপর শুধু এ ধারণাই আমাদের মনে সৃষ্টি হয় না বরং তা যে একদিন অবশ্যি শুরু হবে এ ব্যাপারে সুদৃঢ় বিশ্বাস জন্মে।

৮. মহাকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের পর পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এখানেও আল্লাহর শক্তি ও জ্ঞানের নিদর্শন থেকে পূর্বোক্ত দু'টি চিরন্তন সত্যের (তাওহীদ ও আখেরাত) স্বপক্ষে যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়। ইতিপূর্বে পিছনের আয়াতগুলোতে মহাকাশ জগতের নিদর্শনসমূহ থেকে এরি সপক্ষে দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছিল। এ দলীল-প্রমাণের সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

এক ঃ মহাকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর সাথে পৃথিবীর সম্পর্ক, পৃথিবীর সাথে সূর্য ও চন্দ্রের সম্পর্ক, পৃথিবীর অসংখ্য সৃষ্টির প্রয়োজনের সাথে পাহাড়-পর্বত ও নদী-সাগরের সম্পর্ক—এসব জিনিস এ মর্মে সুস্পষ্টভাবে সাক্ষ দিচ্ছে যে, কোন পৃথক এক স্রষ্টা এদেরকে সৃষ্টি করেনি এবং বিভিন্ন স্বাধীন ক্ষমতাসম্পন্ন সত্তা এদেরকে পরিচালনা করছে না। যদি এমনটি হতো তাহলে এসব জিনিসের মধ্যে এত বেশী পারস্পরিক সম্পর্ক সামঞ্জস্য ও একাত্মতা সৃষ্টি হতো না এবং তা স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকতেও পারতো না। পৃথক পৃথক স্রষ্টার জন্য এটা কেমন করে সম্ভবপর ছিল যে, তারা সবাই মিলে সমগ্র বিশ্ব-জাহানের সৃষ্টি ও পরিচালনার জন্য এমন পরিকল্পনা তৈরী করতেন, যার প্রত্যেকটি জিনিস পৃথিবী থেকে আকাশ পর্যন্ত একটার সাথে আর একটা মিলে যেতে থাকতো এবং কখনো তাদের স্বার্থের মধ্যে কোন প্রকার সংঘাত হতো না?

দুই ঃ পৃথিবীর এ বিশাল গ্রহটির মহাশূন্যে ঝুলে থাকা, এর উপরিভাগে এত বড় বড় পাহাড় জেগে ওঠা, এর বুকের ওপর এ বিশালকায় নদী ও সাগরগুলো প্রবাহিত হওয়া, এর মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের অসংখ্য বৃক্ষরাজির ফলে ফুলে সুশোভিত হওয়া এবং অত্যন্ত নিয়ম-শৃংখলাবদ্ধভাবে অনবরত রাত ও দিনের নিদর্শনের বিস্ময়করভাবে আবর্তিত হওয়া এসব জিনিস যে আল্লাহ এদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর শক্তিমত্তার সাক্ষ দিচ্ছে। এহেন অসীম শক্তিধর মহান সত্তাকে মানুষের মৃত্যুর পর পুনর্বার তাকে জীবন দান করতে অক্ষম মনে করা বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার নয়, নিরেট নির্বুদ্ধিতার প্রমাণ।

তিন ঃ পৃথিবীর ভৌগোলিক রূপকাঠামো, তার ওপর পর্বতমালা সৃষ্টি, পাহাড় থেকে নদী ও ঝরণাধারা প্রবাহিত হবার ব্যবস্থা, সকল প্রকার ফলের মধ্যে দু' ধরনের ফল সৃষ্টি এবং রাতের পরে দিন ও দিনের পরে রাতকে নিয়মিতভাবে আনার মধ্যে যে সীমাহীন প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে তা সরবে সাক্ষ দিয়ে যাচ্ছে যে, যে আল্লাহ

সৃষ্টির এ নকশা তৈরী করেছেন তিনি একজন পূর্ণ জ্ঞানী। এ সমস্ত জিনিসই এ সংবাদ পরিবেশন করে যে, এগুলো কোন সংকল্পবিহীন শক্তির কার্যক্রম এবং কোন উদ্দেশ্যবিহীন খেলোয়াড়ের খেলনা নয়। এর প্রত্যেকটি জিনিসের মধ্যে একজন জ্ঞানীর জ্ঞান এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের পরিপক্ক প্রজ্ঞার সক্রিয়তা দৃষ্টিগোচর হয়। এসব কিছু দেখার পর শুধুমাত্র অজ্ঞ ও মূর্খই এ ধারণা করতে পারে যে, পৃথিবীতে মানুষকে সৃষ্টি করে এবং তাকে এমন সংঘাতমুখর ঘটনাপ্রবাহ সৃষ্টির সুযোগ দিয়ে তিনি তাকে কোন প্রকার হিসেব নিকেশ ছাড়া এমনিই মাটিতে মিশিয়ে দেবেন।

৯. অর্থাৎ সারা পৃথিবীকে তিনি একই ধরনের একটি ভূখণ্ড বানিয়ে রেখে দেননি। বরং তার মধ্যে সৃষ্টি করেছেন অসংখ্য ভূখণ্ড, এ ভূখণ্ডগুলো পরস্পর সংলগ্ন থাকা। সত্ত্বেও আকার-আকৃতি, রং, গঠন, উপাদান, বৈশিষ্ট, শক্তি ও যোগ্যতা এবং উৎপাদন ও রাসায়নিক বা খনিজ সম্পদে পরস্পরের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পর্যায়ে অবস্থান করছে। এ বিভিন্ন ভূখণ্ডের সৃষ্টি এবং তাদের মধ্যে নানা প্রকার বিভিন্নতার অস্তিত্ব এত বিপুল পরিমাণ জ্ঞান ও কল্যাণে পরিপূর্ণ যে, তা গণনা করে শেষ করা যেতে পারে না। অন্যান্য সৃষ্টির কথা বাদ দিয়ে কেবলমাত্র মানুষের স্বার্থকে সামনে রেখে যদি দেখা যায় তাহলে অনুমান করা যেতে পারে যে, মানুষের বিভিন্ন স্বার্থ ও চাহিদা এবং পৃথিবীর এ ভূখণ্ডগুলোর বৈচিত্রের মধ্যে যে সম্পর্ক ও সামঞ্জস্য পাওয়া যায় এবং এসবের বদৌলতে মানুষের সমাজ সংস্কৃতি বিকশিত ও সম্প্রসারিত হবার যে সুযোগ লাভ করে তা নিশ্চিতভাবেই কোন জ্ঞানী ও বিজ্ঞানময় সত্তার চিন্তা, তাঁর সুচিন্তিত পরিকল্পনা এবং বিজ্ঞতাপূর্ণ সংকল্পের ফলশ্রুতি। একে নিছক একটি আকস্মিক ঘটনা মনে করা বিরাট হঠকারিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

১০. কিছু কিছু খেজুর গাছের মূল থেকে একটি খেজুর গাছ বের হয় আবার কিছু কিছুর মূল থেকে একাধিক গাছ বের হয়।

১১. এ আয়াতে আল্লাহর তাওহীদ এবং তাঁর শক্তি ও জ্ঞানের নিদর্শনাবলী দেখানো ছাড়া আরো একটি সত্যের দিকেও সূক্ষ্ম ইশারা করা হয়েছে। এ সত্যটি হচ্ছে, আল্লাহ এ বিশ্ব-জাহানে কোথাও এক রকম অবস্থা রাখেননি। একই পৃথিবী কিন্তু এর ভূখণ্ডগুলোর প্রত্যেকের বর্ণ, আকৃতি ও বৈশিষ্ট আলাদা। একই জমি ও একই পানি, কিন্তু তা থেকে বিভিন্ন প্রকার ফল ও ফসল উৎপন্ন হচ্ছে। একই গাছ কিন্তু তার প্রত্যেকটি ফল একই জাতের হওয়া সত্ত্বেও তাদের আকৃতি, আয়তন ও অন্যান্য বৈশিষ্ট সম্পূর্ণ আলাদা। একই মূল থেকে দু'টি ভিন্ন গাছ বের হচ্ছে এবং তাদের প্রত্যেকেই নিজের একক বৈশিষ্টের অধিকারী। যে ব্যক্তি এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে সে কখনো মানুষের স্বভাব, প্রকৃতি, ঝোঁক-প্রবণতা ও মেজাজের মধ্যে এতবেশী পার্থক্য দেখে পেরেশান হবে না। যেমন এ সূরার সামনের দিকে গিয়ে বলা হয়েছে, যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে সকল মানুষকে একই রকম তৈরী করতে পারতেন কিন্তু যে জ্ঞান ও কৌশলের ভিত্তিতে আল্লাহ এ বিশ্ব-জাহান সৃষ্টি করেছেন তা সমতা, সাম্য ও একাত্মতা নয় বরং বৈচিত্র ও বিভিন্নতার প্রয়াসী। সবাইকে এক ধরনের করে সৃষ্টি করার পর তো এ অস্তিত্বের সমস্ত জীবন প্রবাহই অর্থহীন হয়ে যেতো।

وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۗ
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ ۖ
وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ⑤ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ
بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ
لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ⑥
وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ۗ إِنَّمَا أَنْتَ
مُنْذِرٌ ۖ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ⑦

এখন যদি তুমি বিস্মিত হও, তাহলে লোকদের একথাটিই বিস্ময়কর : "মরে মাটিতে মিশে যাবার পর কি আমাদের আবার নতুন করে পয়দা করা হবে?" এরা এমনসব লোক যারা নিজেদের রবের সাথে কুফরী করেছে।[১২] এরা এমনসব লোক যাদের গলায় শেকল পরানো আছে।[১৩] এরা জাহান্নামী এবং চিরকাল জাহান্নামেই থাকবে।

এ লোকেরা ভালোর পূর্বে মন্দের জন্য তাড়াহুড়ো করছে।[১৪] অথচ এদের আগে (যারাই এ নীতি অবলম্বন করেছে তাদের ওপর আল্লাহর আযাবের) বহু শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত অতীত হয়ে গেছে। একথা সত্য, তোমার রব লোকদের বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও তাদের প্রতি ক্ষমাশীল আবার একথাও সত্য যে, তোমার রব কঠোর শাস্তিদাতা।

যারা তোমার কথা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তারা বলে, "এ ব্যক্তির ওপর এর রবের পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয়নি কেন?"[১৫] —তুমিতো শুধুমাত্র একজন সতর্ককারী, আর প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর জন্য রয়েছে একজন পথপ্রদর্শক।[১৬]

১২. অর্থাৎ তাদের আখেরাত অস্বীকার ছিল মূলত আল্লাহ, তাঁর শক্তিমত্তা ও জ্ঞান অস্বীকারের নামান্তর। তারা কেবল এতটুকুই বলতো না যে, আমাদের মাটিতে মিশে যাবার পর পুনর্বার পয়দা হওয়া অসম্ভব। বরং তাদের এ একই উক্তির মধ্যে এ চিন্তাও প্রচ্ছন্ন রয়েছে যে, (নাউযুবিল্লাহ) যে আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন তিনি শক্তিহীন, অক্ষম, দুর্ভাগ্যপীড়িত, অজ্ঞ ও বুদ্ধিহীন।

১৩. গলায় শেকল পরানো থাকা কয়েদী হবার আলামত। তাদের গলায় শেকল পরানো আছে বলে একথা বুঝানো হচ্ছে যে, তারা নিজেদের মূর্খতা, হঠকারিতা, নফসানী খাহেশাত ও বাপ–দাদার অন্ধ অনুকরণের শেকলে বাঁধা পড়ে আছে। তারা স্বাধীনভাবে চিন্তা–ভাবনা করতে পারে না। অন্ধ স্বার্থ ও গোষ্ঠীপ্রীতি তাদেরকে এমনভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে যে, তারা আখেরাতকে মেনে নিতে পারে না, যদিও তা মেনে নেয়া পুরোপুরি যুক্তিসংগত। আবার অন্যদিকে এর ফলে তারা আখেরাত অস্বীকারের ওপর অবিচল রয়েছে, যদিও তা পুরোপুরি যুক্তিহীন।

১৪. মক্কার কাফেররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতো, যদি তুমি সত্যিই নবী হয়ে থাকো এবং তুমি দেখছো আমরা তোমাকে অস্বীকার করছি, তাহলে তুমি আমাদের যে আযাবের ভয় দেখিয়ে আসছো তা এখন আমাদের ওপর আসছে না কেন? তার আসার ব্যাপারে অযথা বিলম্ব হচ্ছে কেন? কখনো তারা চ্যালেঞ্জের ভংগীতে বলতে থাকে :

رَبَّنَا عَجِّلْ لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ

"হে আমাদের রব! এখনই তুমি আমাদের হিসেব নিকেশ চুকিয়ে দাও। কিয়ামতের জন্য তাকে ঠেকিয়ে রেখো না।"

আবার কখনো বলতে থাকে :

اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ اَوِائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ –

"হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ (সা) যে কথাগুলো পেশ করছে এগুলো যদি সত্য হয় এবং তোমারই পক্ষ থেকে হয় তাহলে আমাদের ওপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করো অথবা অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক আযাব নাযিল করো।"

এ আয়াতে কাফেরদের পূর্বোক্ত কথাগুলোর জবাব দিয়ে বলা হয়েছে : এ মূর্খের দল কল্যাণের আগে অকল্যাণ চেয়ে নিচ্ছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে এদেরকে যে অবকাশ দেয়া হচ্ছে তার সুযোগ গ্রহণ করার পরিবর্তে এরা এ অবকাশকে দ্রুত খতম করে দেয়ার এবং এদের বিদ্রোহাত্মক কর্মনীতির কারণে এদেরকে অনতিবিলম্বে পাকড়াও করার দাবী জানাচ্ছে।

১৫. এখানে তারা এমন নিশানীর কথা বলতে চাচ্ছিল যা দেখে তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আল্লাহর রসূল হবার ওপর ঈমান আনতে পারে। তারা তাঁর কথাকে তার সত্যতার যুক্তির সাহায্যে বুঝতে প্রস্তুত ছিল না। তারা তাঁর পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন জীবনধারা ও চরিত্র থেকে শিক্ষা নিতে প্রস্তুত ছিল না। তাঁর শিক্ষার প্রভাবে তাঁর সাহাবীগণের জীবনে যে ব্যাপক ও শক্তিশালী নৈতিক বিপ্লব সাধিত হচ্ছিল তা থেকেও তারা কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে প্রস্তুত ছিল না। তাদের মুশরিকী ধর্ম এবং জাহেলী কল্পনা ও ভাববাদিতার ভ্রান্তি সুস্পষ্ট করার জন্য কুরআনে যেসব বুদ্ধিদীপ্ত যুক্তি–প্রমাণ উপস্থাপন

اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۭ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ ۝ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ ۝ سَوَاۗءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهٖ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍۢ بِالَّيْلِ وَسَارِبٌۢ بِالنَّهَارِ ۝ لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۭ وَاِذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْۗءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ ۝ هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ۝

২ রুকূ'

আল্লাহ প্রত্যেক গর্ভবতীর গর্ভ সম্পর্কে জানেন। যাকিছু তার মধ্যে গঠিত হয় তাও তিনি জানেন এবং যাকিছু তার মধ্যে কমবেশী হয় সে সম্পর্কেও তিনি খবর রাখেন।[১৭] তাঁর কাছে প্রত্যেক জিনিসের জন্য একটি পরিমাণ নির্দিষ্ট রয়েছে। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যমান প্রত্যেক জিনিসের জ্ঞান রাখেন। তিনি মহান ও সর্বাবস্থায় সবার ওপর অবস্থান করেন। তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি জোরে কথা বলুক বা নীচু স্বরে এবং কেউ রাতের আঁধারে লুকিয়ে থাকুক বা দিনের আলোয় চলতে থাকুক, তাঁর জন্য সবই সমান। প্রত্যেক ব্যক্তির সামনে ও পেছনে তাঁর নিযুক্ত পাহারাদার লেগে রয়েছে, যারা আল্লাহর হুকুমে তার দেখাশুনা করছে।[১৮] আসলে আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত কোন জাতির অবস্থা বদলান না যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের গুণাবলী বদলে ফেলে। আর আল্লাহ যখন কোন জাতিকে দুর্ভাগ্য কবলিত করার ফায়সালা করে ফেলেন তখন কারো রদ করায় তা রদ হতে পারে না এবং আল্লাহর মোকাবিলায় এমন জাতির কোন সহায় ও সাহায্যকারী হতে পারে না।[১৯]

তিনিই তোমাদের সামনে বিজলী চমকান, যা দেখে তোমাদের মধ্যে আশংকার সঞ্চার হয় আবার আশাও জাগে।

করা হচ্ছিল তারা সেগুলোর প্রতি কর্ণপাত করতে প্রস্তুত ছিল না। এসব বাদ দিয়ে তারা চাচ্ছিল তাদেরকে এমন কোন তেলেসমাতি দেখানো হোক যার মাধ্যমে তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যাচাই করতে পারে।

১৬. এটি হচ্ছে তাদের দাবীর সংক্ষিপ্ত জবাব। তাদেরকে সরাসরি এ জবাব দেবার পরিবর্তে আল্লাহ তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে এ জবাব দিয়েছেন। এর অর্থ হচ্ছে, হে নবী। তাদেরকে নিশ্চিন্ত করার জন্য কোন্ ধরনের তেলেসমাতি দেখানো হবে এ ব্যাপারটি নিয়ে তুমি কোন চিন্তা করো না। প্রত্যেককে নিশ্চিন্ত করা তোমার কাজ নয়। তোমার কাজ হচ্ছে কেবলমাত্র গাফলতির ঘুমে বিভোর লোকদেরকে জাগিয়ে দেয়া এবং ভুল পথে চলার পরিণাম সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা। প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক জাতির মধ্যে একজন হেদায়াতকারী নিযুক্ত করে আমি এ দায়িত্ব সম্পাদন করেছি। এখন তোমাকেও এ দায়িত্ব সম্পাদনে নিয়োজিত করা হয়েছে। এরপর যার মন চায় চোখ খুলতে পারে এবং যার মন চায় গাফলতির মধ্যে ডুবে থাকতে পারে। এ সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে আল্লাহ তাদের দাবীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং তাদেরকে এ বলে সতর্ক করে দেন যে, তোমরা এমন কোন রাজ্যে বাস করছো না যেখানে কোন শাসন, শৃংখলা ও কর্তৃত্ব নেই। তোমাদের সম্পর্ক এমন এক আল্লাহর সাথে যিনি তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তিকে যখন সে তার মায়ের জঠরে আবদ্ধ ছিল তখন থেকেই জানেন এবং সারা জীবন তোমাদের প্রত্যেকটি কাজের প্রতি নজর রাখেন। তাঁর দরবারে তোমাদের ভাগ্য নির্ণীত হবে নির্ভেজাল আদল ও ইনসাফের ভিত্তিতে, তোমাদের প্রত্যেকের দোষ-গুণের প্রেক্ষিতে। পৃথিবী ও আকাশে তাঁর ফায়সালাকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা কারোর নেই।

১৭. এর অর্থ হচ্ছে, মায়ের গর্ভাশয়ে ভ্রূণের অংগ-প্রত্যংগ, শক্তি-সামর্থ, যোগ্যতা ও মানসিক ক্ষমতার মধ্যে যাবতীয় হ্রাস-বৃদ্ধি আল্লাহর সরাসরি তত্ত্বাবধানে সাধিত হয়।

১৮. অর্থাৎ ব্যাপার শুধু এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয় যে, আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে সব অবস্থায় নিজেই সরাসরি দেখছেন এবং তার সমস্ত গতি-প্রকৃতি ও কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত রয়েছেন বরং আল্লাহর নিযুক্ত তত্ত্বাবধায়কও প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে রয়েছেন এবং তার জীবনের সমস্ত কার্যক্রমের রেকর্ডও সংরক্ষণ করে চলছেন। এ সত্যটি বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, এমন অকল্পনীয় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহর সার্বভৌম কর্তত্বের অধীন থেকে যারা একথা মনে করে জীবন যাপন করে যে, তাদেরকে লাগামহীন উটের মতো দুনিয়ায় ছেড়ে দেয়া হয়েছে এবং তাদের কার্যকলাপের জন্য কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে না। তারা আসলে নিজরাই নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনে।

১৯. অর্থাৎ এ ধরনের ভুল ধারণা পোষণ করো না যে, তোমরা যাই কিছু করতে থাকো না কেন আল্লাহর দরবারে এমন কোন শক্তিশালী পীর, ফকীর বা কোন পূর্ববর্তী-পরবর্তী মহাপুরুষ অথবা কোন জিন বা ফেরেশতা আছে যে তোমাদের নযরানার উৎকোচ নিয়ে তোমাদেরকে অসৎকাজের পরিণাম থেকে বাঁচাবে।

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهٖ ۚ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ
فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِى اللّٰهِ ۚ وَهُوَ شَدِيدُ
الْمِحَالِ ⑬ لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ ۖ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهٖ لَا يَسْتَجِيبُونَ
لَهُمْ بِشَىْءٍ اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهٖ ۚ
وَمَا دُعَآءُ الْكٰفِرِينَ اِلَّا فِى ضَلٰلٍ ⑭ وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ⑮

তিনিই পানিভরা মেঘ উঠান। মেঘের গর্জন তাঁর প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে[২০] এবং ফেরেশতারা তাঁর ভয়ে কম্পিত হয়ে তাঁর তাস্‌বীহ করে।[২১] তিনি বজ্রপাত করেন এবং (অনেক সময়) তাকে যার ওপর চান, ঠিক সে যখন আল্লাহ সম্পর্কে বিতণ্ডায় লিপ্ত তখনই নিক্ষেপ করেন। আসলে তাঁর কৌশল বড়ই জবরদস্ত।[২২]

একমাত্র তাঁকেই ডাকা সঠিক।[২৩] আর অন্যান্য সত্তাসমূহ, আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে এ লোকেরা ডাকে, তারা তাদের প্রার্থনার কোন সাড়া দিতে পারে না। তাদেরকে ডাকা তো ঠিক এমনি ধরনের যেমন কোন ব্যক্তি পানির দিকে হাত বাড়িয়ে তার কাছে আবেদন জানায়, তুমি আমার মুখে পৌঁছে যাও, অথচ পানি তার মুখে পৌঁছতে সক্ষম নয়। ঠিক এমনিভাবে কাফেরদের দোয়াও একটি লক্ষভ্রষ্ট তীর ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহকেই সিজ্‌দা করছে পৃথিবী ও আকাশের প্রত্যেকটি বস্তু ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায়[২৪] এবং প্রত্যেকটি বস্তুর ছায়া সকাল-সাঁঝে তাঁর সামনে নত হয়।[২৫]

২০. অর্থাৎ মেঘের গর্জন একথা প্রকাশ করে যে, যে আল্লাহ এ বায়ু পরিচালিত করেছেন, বাষ্প উঠিয়েছেন, ঘন মেঘরাশিকে একত্র করেছেন, এ বিদ্যুৎকে বৃষ্টির মাধ্যম বা উপলক্ষ বানিয়েছেন এবং এভাবে পৃথিবীর সৃষ্টিকুলের জন্য পানির ব্যবস্থা করেছেন তিনি যাবতীয় ভুল-ত্রুটি-অভাব মুক্ত, তিনি জ্ঞান ও শক্তির দিক দিয়ে পূর্ণতার অধিকারী। তাঁর গুণাবলী সকল প্রকার আবিলতা থেকে মুক্ত এবং নিজের প্রভুত্বের ক্ষেত্রে তাঁর কোন অংশীদার নেই। পশুর মতো নির্বোধ শ্রবণ শক্তির অধিকারীরা তো এ মেঘের মধ্যে শুধু গর্জনই শুনতে পায় কিন্তু বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন সজাগ শ্রবণ শক্তির অধিকারীরা মেঘের গর্জনে তাওহীদের গুরুগম্ভীর বাণী শুনে থাকে।

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قُلِ اللّٰهُ ؕ قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۙ۬ اَمْ هَلْ تَسْتَوِى الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ ۚ۬ اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ؕ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿١٦﴾

এদেরকে জিজ্ঞেস করো, আকাশ ও পৃথিবীর রব কে? —বলো আল্লাহ![২৬] তারপর এদেরকে জিজ্ঞেস করো, আসল ব্যাপার যখন এই তখন তোমরা কি তাঁকে বাদ দিয়ে এমন মাবুদদেরকে নিজেদের কার্যসম্পাদনকারী বানিয়ে নিয়েছো যারা তাদের নিজেদের জন্যও কোন লাভ ও ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না? বলো অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হয়ে থাকে?[২৭] আলো ও আঁধার কি এক রকম হয়?[২৮] যদি এমন না হয়, তাহলে তাদের বানানো শরীকরাও কি আল্লাহর মতো কিছু সৃষ্টি করেছে, যে কারণে তারাও সৃষ্টি ক্ষমতার অধিকারী বলে সন্দেহ হয়েছে?[২৯] — বলো, প্রত্যেকটি জিনিসের স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ। তিনি একক ও সবার ওপর পরাক্রমশালী।[৩০]

২১. আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের মহিমান্বিত প্রকাশে ফেরেশতাদের প্রকম্পিত হওয়া এবং তাঁর তাসবীহ ও প্রশংসা গীতি গাইতে থাকার কথা বিশেষভাবে এখানে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে এই যে, মুশরিকরা প্রত্যেক যুগে ফেরেশতাদেরকে দেবতা ও উপাস্য গণ্য করে এসেছে এবং আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বে তাদেরকে শরীক মনে করে এসেছে। এ ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদ করে বলা হয়েছে, সার্বভৌম কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে তারা আল্লাহর সাথে শরীক নয় বরং তারা তাঁর অনুগত সেবক মাত্র এবং প্রভুর কর্তৃত্ব মহিমায় প্রকম্পিত হয়ে তারা তার প্রশংসা গীতি গাইছে।

২২. অর্থাৎ তাঁর কাছে অসংখ্য কৌশল রয়েছে। যে কোন সময় যে কারো বিরুদ্ধে যে কোন কৌশল তিনি এমন পদ্ধতিতে ব্যবহার করতে পারেন যে, আঘাত আসার এক মুহূর্ত আগেও সে জানতে পারে না কখন কোন্ দিক থেকে তার ওপর আঘাত আসছে। এ ধরনের একচ্ছত্র শক্তিশালী সত্তা সম্পর্কে যারা না ভেবেচিন্তে এমনি হাল্কাভাবে আজে–বাজে কথা বলে, কে তাদের বুদ্ধিমান বলতে পারে?

২৩. ডাকা মানে নিজের অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে সাহায্যের জন্য ডাকা। এর মানে হচ্ছে, অভাব ও প্রয়োজন পূর্ণ এবং সংকটমুক্ত করার সব ক্ষমতা একমাত্র তাঁর হাতেই কেন্দ্রীভূত। তাই একমাত্র তাঁর কাছেই প্রার্থনা করা সঠিক ও যথার্থ সত্য বলে বিবেচিত।

২৪. সিজ্দা মানে আনুগত্য প্রকাশ করার জন্য ঝুঁকে পড়া, আদেশ পালন করা এবং পুরোপুরি মেনে নিয়ে মাথা নত করা। পৃথিবী ও আকাশের প্রত্যেকটি সৃষ্টি আল্লাহর আইনের অনুগত এবং তাঁর ইচ্ছার চুল পরিমাণও বিরোধিতা করতে পারে না—এ অর্থে তারা প্রত্যেকেই আল্লাহকে সিজদা করছে। মুমিন স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে তাঁর সামনে নত হয় কিন্তু কাফেরকে বাধ্য হয়ে নত হতে হয়। কারণ আল্লাহর প্রাকৃতিক আইনের বাইরে চলে যাওয়ার ক্ষমতা তার নেই।

২৫. ছায়ার নত হওয়ার ও সিজদা করার মানে হচ্ছে, বস্তুর ছায়ার সকাল-সাঁঝে পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ঢলে পড়া এমন একটি আলামত যা থেকে বুঝা যায় যে, এসব জিনিস কারো হুকুমের অনুগত এবং কারোর আইনের অধীন।

২৬. উল্লেখ করা যেতে পারে, আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশের রব একথা তারা নিজেরা মানতো। এ প্রশ্নের জবাবে তারা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতে পারতো না। কারণ একথা অস্বীকার করলে তাদের নিজেদের আকীদাকেই অস্বীকার করা হতো। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জিজ্ঞাসার পর তারা এর জবাব পাশ কাটিয়ে যেতে চাচ্ছিল। কারণ স্বীকৃতির পর তাওহীদকে মেনে নেয়া অপরিহার্য হয়ে উঠতো এবং এরপর শিরকের জন্য আর কোন যুক্তিসংগত বুনিয়াদ থাকতো না। তাই নিজেদের অবস্থানের দুর্বলতা অনুভব করেই তারা এ প্রশ্নের জবাবে নীরব হয়ে যেতো। এ কারণেই কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, ওদেরকে জিজ্ঞেস করো পৃথিবী ও আকাশের স্রষ্টা কে? বিশ্ব-জাহানের রব কে? কে তোমাদের রিযিক দিচ্ছেন? তারপর হুকুম দেন, তোমরা নিজেরাই বলো আল্লাহ এবং এরপর এভাবে যুক্তি পেশ করেন যে, আল্লাহই যখন এ সমস্ত কাজ করছেন তখন আর কে আছে যার তোমরা বন্দেগী করে আসছো?

২৭. অন্ধ বলে এমন ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যার সামনে বিশ্ব-জগতের চতুরদিকে আল্লাহর একত্বের চিহ্ন ও প্রমাণ ছড়িয়ে আছে কিন্তু সে তার মধ্য থেকে কোন একটি জিনিসও দেখছে না। আর চক্ষুষ্মান হচ্ছে এমন এক ব্যক্তি, যার দৃষ্টি বিশ্ব-জগতের প্রতিটি অণু-কণিকায় এবং প্রতিটি পত্র-পল্লবে একজন অসাধারণ কারিগরের অতুলনীয় কারিগরীর নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে। আল্লাহর এ প্রশ্নের অর্থ হচ্ছে ঃ ওহে বুদ্ধিভ্রষ্টেরা। যদি তোমরা কিছুই দেখতে না পেয়ে থাকো তাহলে যাদের দেখার মতো চোখ আছে তারা কেমন করে নিজেদের চোখ বন্ধ করে নেবে? যে ব্যক্তি সত্যকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে কেমন করে দৃষ্টিশক্তিহীন লোকদের মতো আচরণ করবে এবং পথে বিপথে ঘুরে বেড়াবে?

২৮. আলো মানে সত্যজ্ঞানের আলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর অনুসারীরা এ সত্য জ্ঞানের আলো লাভ করেছিলেন। আর আঁধার মানে মূর্খতার আঁধার। নবীর অস্বীকারকারীরা এ আঁধারে পথ হারিয়ে ফেলেছিল। প্রশ্নের অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি আলো পেয়ে গেছে সে কেন নিজের প্রদীপ নিভিয়ে দিয়ে আঁধারের বুকে হোঁচট খেয়ে ফিরতে থাকবে? তোমাদের কাছে আলোর মর্যাদা না থাকলে না থাকতে পারে কিন্তু যে তার সন্ধান পেয়েছে, যে আলো ও আঁধারের পার্থক্য জেনে ফেলেছে এবং যে দিনের আলোয়

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ
زَبَدًا رَّابِيًا ۚ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ
زَبَدٌ مِّثْلُهُ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا الزَّبَدُ
فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ
كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴿١٧﴾

আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন এবং প্রত্যেক নদী–নালা নিজের সাধ্য অনুযায়ী তা নিয়ে প্রবাহিত হয়। তারপর যখন প্লাবন আসে তখন ফেনা পানির ওপরে ভাসতে থাকে।[৩১] *আর লোকেরা অলংকার ও তৈজসপত্রাদি নির্মাণের জন্য যেসব ধাতু গরম করে তার ওপরও ঠিক এমনি ফেনা ভেসে ওঠে।*[৩২] *এ উপমার সাহায্যে আল্লাহ হক ও বাতিলের বিষয়টি সুস্পষ্ট করে দেন। ফেনারাশি উড়ে যায় এবং যে বস্তুটি মানুষের জন্য উপকারী হয় তা যমীনে থেকে যায়। এভাবে আল্লাহ উপমার সাহায্যে নিজের কথা বুঝিয়ে থাকেন।*

সোজা পথ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে কেমন করে আলো ত্যাগ করে আঁধারের মধ্যে পথ হাতড়ে বেড়াতে পারে?

২৯. এ প্রশ্নের অর্থ হচ্ছে, যদি দুনিয়ার কিছু জিনিস আল্লাহ সৃষ্টি করে থাকতেন এবং কিছু জিনিস অন্যেরা সৃষ্টি করতো আর কোন্‌টা আল্লাহর সৃষ্টি এবং কোন্‌টা অন্যদের এ পার্থক্য করা সম্ভব না হতো তাহলে তো সত্যিই শিরকের জন্য কোন যুক্তিসংগত ভিত্তি হতে পারতো। কিন্তু যখন এ মুশরিকরা নিজেরাই তাদের মাবুদদের একজনও একটি তৃণ এবং একটি চুলও সৃষ্টি করেনি বলে স্বীকার করে এবং যখন তারা একথাও স্বীকার করে যে, সৃষ্টিকর্মে এ বানোয়াট ইলাহ্‌দের সামান্যতমও অংশ নেই। তখন এ বানোয়াট মাবুদদেরকে স্রষ্টার ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও অধিকারে শামিল করা হলো কিসের ভিত্তিতে?

৩০. মূল আয়াতে 'কাহ্‌হার' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, এমন সত্তা যিনি নিজ শক্তিতে সবার ওপর হুকুম চালান এবং সবাইকে অধীনস্থ করে রাখেন। "আল্লাহ প্রত্যেকটি জিনিসের স্রষ্টা" একথাটি এমন একটি সত্য যাকে মুশরিকরাও স্বীকার করে নিয়েছিল এবং তারা কখনো এটা অস্বীকার করেনি। "তিনি একক ও মহাপরাক্রমশালী" একথাটি হচ্ছে মুশরিকদের ঐ স্বীকৃত সত্যের অনিবার্য ফল। প্রথম সত্যটি মেনে নেবার পর কোন জ্ঞান–বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে একে অস্বীকার করা সম্ভবপর নয়। কারণ

لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٨﴾

যারা নিজেদের রবের দাওয়াত গ্রহণ করেছে তাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে আর যারা তা গ্রহণ করেনি তারা যদি পৃথিবীর সমস্ত সম্পদের মালিক হয়ে যায় এবং এ পরিমাণ আরো সংগ্রহ করে নেয় তাহলেও তারা আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচার জন্য এ সমস্তকে মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে দিতে তৈরী হয়ে যাবে।[৩৩] *এদের হিসেব নেয়া হবে নিকৃষ্টভাবে*[৩৪] *এবং এদের আবাস হবে জাহান্নাম, বড়ই নিকৃষ্ট আবাস।*

যিনি প্রত্যেকটি জিনিসের স্রষ্টা নিসন্দেহে তিনি একক, অতুলনীয় ও সাদৃশ্যবিহীন। কারণ অন্য যা কিছু আছে সবই তাঁর সৃষ্টি। এ অবস্থায় কোন সৃষ্টি কেমন করে তার স্রষ্টার সত্তা, গুণাবলী, ক্ষমতা বা অধিকারে তাঁর সাথে শরীক হতে পারে? এভাবে তিনি নিসন্দেহে মহাপরাক্রমশালীও। কারণ সৃষ্টি তার স্রষ্টার অধীন হয়ে থাকবে, এটি সৃষ্টি–ধারণার অংগীভূত। সৃষ্টির ওপর স্রষ্টার যদি পূর্ণ কর্তৃত্ব ও দখল না থাকে তাহলে তিনি সৃষ্টিকর্মই বা করবেন কেমন করে? কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্রষ্টা বলে মানে তার পক্ষে এ দু'টি বুদ্ধিবৃত্তিক ও ন্যায়ানুগ ফলশ্রুতি অস্বীকার করা সম্ভবপর হয় না। কাজেই এরপরে কোন ব্যক্তি স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে সৃষ্টির বন্দেগী করবে এবং মহাপরাক্রমশালীকে বাদ দিয়ে দুর্বল ও অধীনকে সংকট উত্তরণ করাবার জন্য আহবান জানাবে, একথা একেবারেই অযৌক্তিক প্রমাণিত হয়।

৩১. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অহীর মাধ্যমে যে জ্ঞান নাযিল করা হয়েছিল এ উপমায় তাকে বৃষ্টির সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর ঈমানদার, সুস্থ ও ভারসাম্যপূর্ণ স্বাভাবিক বৃত্তির অধিকারী মানুষদেরকে এমনসব নদীনালার সাথে তুলনা করা হয়েছে যেগুলো নিজ নিজ ধারণক্ষমতা অনুযায়ী রহমতের বৃষ্টি ধারায় নিজদেরকে পরিপূর্ণ করে প্রবাহিত হতে থাকে। অন্যদিকে সত্য অস্বীকারকারী ও সত্য বিরোধীরা ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে যে হৈ–হাংগামা ও উপদ্রব সৃষ্টি করেছিল তাকে এমন ফেনা ও আবর্জনারাশির সাথে তুলনা করা হয়েছে যা হামেশা বন্যা শুরু হবার সাথে সাথেই পানির উপরিভাগে উঠে আসতে থাকে।

৩২. অর্থাৎ নির্ভেজাল ধাতু গলিয়ে কাজে লাগাবার জন্য স্বর্ণকারের চুলা গরম করা হয়। কিন্তু যখনই এ কাজ করা হয় তখনই অবশ্যি ময়লা আবর্জনা ওপরে ভেসে ওঠে এবং এমনভাবে তা ঘূর্ণিত হতে থাকে যাতে কিছুক্ষণ পর্যন্ত উপরিভাগে শুধু আবর্জনারাশিই দৃষ্টিগোচর হতে থাকে।

৩৩. অর্থাৎ তখন তাদের ওপর এমন বিপদ আসবে যার ফলে তারা নিজেদের জান বাঁচাবার জন্য দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ দিয়ে দেবার ব্যাপারে একটুও ইতস্তত করবে না।

أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ ۚ
إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿١٩﴾ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ
وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ ﴿٢٠﴾ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ
وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ﴿٢١﴾ وَالَّذِينَ صَبَرُوا
ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا
وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٢﴾

৩ রুকূ'

আচ্ছা তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার ওপর যে কিতাব নাযিল হয়েছে, তাকে যে ব্যক্তি সত্য মনে করে আর যে ব্যক্তি এ সত্যটির ব্যাপারে অন্ধ, তারা দু'জন সমান হবে, এটা কেমন করে সম্ভব?[৩৫] উপদেশ তো শুধু বিবেকবান লোকেরাই গ্রহণ করে।[৩৬] আর তাদের কর্মপদ্ধতি এমন হয় যে, তারা আল্লাহকে প্রদত্ত নিজেদের অংগীকার পালন করে এবং তাকে মজবুত করে বাঁধার পর ভেঙ্গে ফেলে না।[৩৭] তাদের নীতি হয়, আল্লাহ যেসব সম্পর্ক ও বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখার হুকুম দিয়েছেন[৩৮] সেগুলো তারা অক্ষুণ্ন রাখে, নিজেদের রবকে ভয় করে এবং তাদের থেকে কড়া হিসেব না নেয়া হয় এই ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে। তাদের অবস্থা হয় এই যে, নিজেদের রবের সন্তুষ্টির জন্য তারা সবর করে,[৩৯] নামায কায়েম করে, আমার দেয়া রিযিক থেকে প্রকাশ্যে ও গোপনে খরচ করে এবং ভালো দিয়ে মন্দ দূরীভূত করে।[৪০] আখেরাতের গৃহ হচ্ছে তাদের জন্যই। অর্থাৎ এমন সব বাগান যা হবে তাদের চিরস্থায়ী আবাস।

৩৪. নিকৃষ্টভাবে হিসেব নেয়া অথবা কড়া হিসেব নেয়ার মানে হচ্ছে এই যে, মানুষের কোন ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করা হবে না। তার কোন অপরাধের বিচার না করে তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে না।

কুরআন আমাদের জানায়, এ ধরনের হিসেব আল্লাহ তাঁর এমন বান্দাদের থেকে নেবেন যারা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে দুনিয়ায় জীবন যাপন করেছে। বিপরীতপক্ষে যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বস্ত আচরণ করেছে এবং তাঁর প্রতি অনুগত থেকে জীবন যাপন করেছে তাদের থেকে "সহজ হিসেব" অর্থাৎ হাল্কা হিসেব নেয়া হবে। তাদের বিশ্বস্ততামূলক কার্যক্রমের মোকাবিলায় ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো মাফ করে দেয়া হবে। তাদের সামগ্রিক

কর্মনীতির সুকৃতিকে সামনে রেখে তাদের বহু ভুল-ভ্রান্তি উপেক্ষা করা হবে। হযরত আয়েশা (রা) থেকে আবু দাউদে যে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে সেখানে এ বিষয়টির আরো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার কাছে আল্লাহর কিতাবের সবচেয়ে ভয়াবহ আয়াত হচ্ছে সেই আয়াতটি যাতে বলা হয়েছে ঃ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءً يُجْزَ بِهٖ অর্থাৎ "যে ব্যক্তি কোন খারাপ কাজ করবে সে তার শাস্তি পাবে।" একথায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আয়েশা! তুমি কি জানো না, আল্লাহর বিশ্বস্ত ও অনুগত বান্দা দুনিয়ায় যে কষ্টই পেয়েছে, এমনকি তার শরীরে যদি কোন কাঁটাও ফুটে থাকে তাহলে তাকে তার কোন অপরাধের শাস্তি হিসেবে গণ্য করে দুনিয়াতেই তার হিসেব পরিষ্কার করে দেন? আখেরাতে তো যারই হিসেব শুরু হবে সে অবশ্যি শাস্তি পাবে। হযরত আয়েশা (রা) বললেন, তাহলে আল্লাহর এ উক্তির তাৎপর্য কি যাতে বলা হয়েছে—

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتَابَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا ؟

"যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে তার থেকে হাল্কা হিসেব নেয়া হবে।"

এর জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এর অর্থ হচ্ছে, উপস্থাপনা (অর্থাৎ তার সৎকাজের সাথে সাথে অসৎকাজগুলোর উপস্থাপনা আল্লাহর সামনে) অবশ্যি হবে কিন্তু যাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, তার ব্যাপারে জেনে রাখো, সে মারা পড়েছে।

৩৫. অর্থাৎ এ দু' ব্যক্তির নীতি দুনিয়ায় এক রকম হতে পারে না এবং আখেরাতে তাদের পরিণামও একই ধরনের হতে পারে না।

৩৬. অর্থাৎ আল্লাহর পাঠানো এ শিক্ষা এবং আল্লাহর রসূলের এ দাওয়াত যারা গ্রহণ করে তারা বুদ্ধিভ্রষ্ট হয় না বরং তারা হয় বিবেকবান, সতর্ক ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। এ ছাড়া দুনিয়ায় তাদের জীবন ও চরিত্র যে রূপ ধারণ করে এবং আখেরাতে তারা যে পরিণাম ফল ভোগ করে পরবর্তী আয়াতগুলোতে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

৩৭. এর অর্থ হচ্ছে সেই অনন্তকালীন অংগীকার যা সৃষ্টির শুরুতেই আল্লাহ সমস্ত মানুষের কাছ থেকে নিয়েছিলেন। তিনি অংগীকার নিয়েছিলেন, মানুষ একমাত্র তাঁর বন্দেগী করবে (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন সূরা আ'রাফ ১৩৪ ও ১৩৫ টীকা)। প্রত্যেকটি মানুষের কাছ থেকে এ অংগীকার নেয়া হয়েছিল। প্রত্যেকের প্রকৃতির মধ্যে এটি নিহিত রয়েছে। যখনই আল্লাহর সৃজনী কর্মের মাধ্যমে মানুষ অস্তিত্ব লাভ করে এবং তাঁর প্রতিপালন কর্মকাণ্ডের আওতাধীনে সে প্রতিপালিত হতে থাকে তখনই এটি পাকাপোক্ত হয়ে যায়। আল্লাহর রিযিকের সাহায্যে জীবন যাপন করা, তাঁর সৃষ্ট প্রত্যেকটি বস্তুকে কাজে লাগানো এবং তাঁর দেয়া শক্তিগুলো ব্যবহার করা—এগুলো মানুষকে স্বতস্ফূর্তভাবে একটি বন্দেগীর অংগীকারে বেঁধে ফেলে। কোন সচেতন ও বিশ্বস্ত মানুষ এ অংগীকার ভেংগে ফেলার সাহস করতে পারে না। তবে হাঁ, অজান্তে কখনো সে কোন ভুল করে ফেলতে পারে, সেটা অবশ্যি ভিন্ন কথা।

৩৮. অর্থাৎ এমন সব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক, যেগুলো সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হলেই মানুষের সামগ্রিক জীবনের কল্যাণ ও সাফল্য নিশ্চিত হয়।

৩৯. অর্থাৎ নিজেদের প্রবৃত্তি ও আকাংখা নিয়ন্ত্রণ করে, নিজেদের আবেগ, অনুভূতি ও ঝোঁক প্রবণতাকে নিয়ম ও সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখে, আল্লাহর নাফরমানিতে বিভিন্ন স্বার্থলাভ ও ভোগ–লালসার চরিতার্থ হওয়ার সুযোগ দেখে পা পিছলে যায় না এবং আল্লাহর হুকুম মেনে চলার পথে যেসব ক্ষতি ও কষ্টের আশংকা দেখা দেয় সেসব বরদাশ্‌ত করে যেতে থাকে। এ দৃষ্টিতে বিচার করলে মুমিন আসলে পুরোপুরি একটি সবরের জীবন যাপন করে। কারণ সে আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় এবং আখেরাতের স্থায়ী পরিণাম ফলের পতি দৃষ্টি রেখে এ দুনিয়ায় আত্মসংযম করতে থাকে এবং সবরের সাথে মনের প্রতিটি পাপ প্রবণতার মোকাবিলা করে।

৪০. অর্থাৎ তারা মন্দের মোকাবিলায় মন্দ করে না বরং ভালো করে। তারা অন্যায়ের মোকাবিলা অন্যায়কে সাহায্য না করে ন্যায়কে সাহায্য করে। কেউ তাদের প্রতি যতই জুলুম করুক না কেন তার জবাবে তারা পাল্‌টা জুলুম করে না বরং ইনসাফ করে। কেউ তাদের বিরুদ্ধে যতই মিথ্যাচার করুক না কেন জবাবে তারা সত্যই বলে। কেউ তাদের সাথে যতই বিশ্বাস ভংগ করুক না কেন জবাবে তারা বিশ্বস্ত আচরণই করে থাকে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নোক্ত হাদীসটি এ অর্থই প্রকাশ করে ঃ

لَا تَكُوْنُوْا اِمَّعَةً ، تَقُوْلُوْنَ اِنْ اَحْسَنَ النَّاسُ اَحْسَنَّا وَاِنْ ظَلَمُوْنَا ظَلَمْنَا وَلٰكِنْ وَطِّنُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنْ اَحْسَنَ النَّاسُ اَنْ تُحْسِنُوْا وَاِنْ اَسَاؤُا فَلَا تَظْلِمُوْا –

"তোমরা নিজেদের কার্যধারাকে অন্যের কর্মধারার অনুসারী করো না। একথা বলা ঠিক নয় যে লোকেরা ভালো করলে আমরা ভালো করবো এবং লোকেরা জুলুম করলে আমরাও জুলুম করবো। তোমরা নিজেদেরকে একটি নিয়মের অধীন করো। যদি লোকেরা সদাচার করে তাহলে তোমরাও সদাচার করো। আর যদি লোকেরা তোমাদের সাথে অসৎ আচরণ করে তাহলে তোমরা জুলুম করো না।"

রসূলুল্লাহর (সা) এ হাদীসটিও এ একই অর্থ প্রকাশ করে, যাতে বলা হয়েছে ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ আমাকে নয়টি বিষয়ের হুকুম দিয়েছেন। এর মধ্যে তিনি এ চারটি কথা বলেছেন ঃ কারোর প্রতি সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট যাই থাকি না কেন সর্বাবস্থায় আমি যেন ইনসাফের কথা বলি। যে আমার অধিকার হরণ করে আমি যেন তার অধিকার আদায় করি। যে আমাকে বঞ্চিত করবে আমি যেন তাকে দান করি। আর যে আমার প্রতি জুলুম করবে আমি যেন তাকে মাফ করে দেই। আর এ হাদীসটিও এ একই অর্থ প্রকাশ করে, যাতে বলা হয়েছে ঃ لا تخن من خانك অর্থাৎ "যে তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তুমি তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করো না।" হযরত উমরের (রা) নিম্নোক্ত উক্তিটিও এ অর্থ প্রকাশ করে ঃ "যে ব্যক্তি তোমার প্রতি আচরণ করার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে না তুমি আল্লাহকে ভয় করে তার প্রতি আচরণ করো।"

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ
وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾ سَلٰمٌ
عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٤﴾ وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ
مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى
الْاَرْضِ ۙ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ﴿٢٥﴾ اَللّٰهُ يَبْسُطُ
الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ؕ وَفَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ
الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ ﴿٢٦﴾

তারা নিজেরা তার মধ্যে প্রবেশ করবে এবং তাদের বাপ–দাদারা ও স্ত্রী–সন্তানদের মধ্য থেকে যারা সৎকর্মশীল হবে তারাও তাদের সাথে সেখানে যাবে। ফেরেশতারা সব দিক থেকে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য আসবে এবং তাদেরকে বলবে ঃ "তোমাদের প্রতি শান্তি।[৪১] তোমরা দুনিয়ায় যেভাবে সবর করে এসেছো তার বিনিময়ে আজ তোমরা এর অধিকারী হয়েছো।"—কাজেই কতই চমৎকার এ আখেরাতের গৃহ! আর যারা আল্লাহর অংগীকারে মজবুতভাবে আবদ্ধ হবার পর তা ভেঙে ফেলে, আল্লাহ যেসব সম্পর্ক জোড়া দেবার হুকুম দিয়েছেন সেগুলো ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে তারা লানতের অধিকারী এবং তাদের জন্য রয়েছে আখেরাতে বড়ই খারাপ আবাস।

আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রিযিক সম্প্রসারিত করেন এবং যাকে চান মাপাজোকা রিযিক দান করেন।[৪২] এরা দুনিয়ার জীবনে উল্লসিত, অথচ দুনিয়ার জীবন আখেরাতের তুলনায় সামান্য সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়।

৪১. এর মানে কেবল এ নয় যে, ফেরেশতারা চারদিক থেকে এসে তাদেরকে সালাম করতে থাকবে বরং তারা তাদেরকে এ সুখবরও দেবে যে, এখন তোমরা এমন জায়গায় এসেছো যেখানে পরিপূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজমান। এখন তোমরা এখানে সবরকমের আপদ–বিপদ, কষ্ট, কাঠিন্য, কঠোর পরিশ্রম, শংকা ও আতংকমুক্ত। (আরো বেশী জানার জন্য দেখুন সূরা হিজ্‌র ২৯ টীকা)

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۚ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴿٢٧﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ ﴿٢٩﴾ كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ لِّتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ ۚ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ﴿٣٠﴾

৪ রুকূ'

যারা (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত মেনে নিতে) অস্বীকার করেছে তারা বলে, "এ ব্যক্তির কাছে এর রবের পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয়নি কেন?"[৪৩] *বলো, আল্লাহ যাকে চান গোমরাহ করে দেন এবং তিনি তাকেই তাঁর দিকে আসার পথ দেখান যে তাঁর দিকে রুজু করে।*[৪৪] *তারাই এ ধরনের লোক যারা (এ নবীর দাওয়াত) গ্রহণ করেছে এবং আল্লাহর স্মরণে তাদের চিত্ত প্রশান্ত হয়। সাবধান হয়ে যাও। আল্লাহর স্মরণই হচ্ছে এমন জিনিস যার সাহায্যে চিত্ত প্রশান্তি লাভ করে। তারপর যারা সত্যের দাওয়াত মেনে নিয়েছে এবং সৎকাজ করেছে তারা সৌভাগ্যবান এবং তাদের জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম।*

হে মুহাম্মাদ! এহেন মাহাত্ম সহকারে আমি তোমাকে নবী বানিয়ে পাঠিয়েছি[৪৫] *এমন এক জাতির মধ্যে যার আগে বহু জাতি অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, যাতে তোমার কাছে আমি যে পয়গাম অবতীর্ণ করেছি তা তুমি এদেরকে শুনিয়ে দাও, এমন অবস্থায় যখন এরা নিজেদের পরম দয়াময় আল্লাহকে অস্বীকার করছে।*[৪৬] *এদেরকে বলে দাও, তিনিই আমার রব, তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই, তাঁরই ওপর আমি ভরসা করেছি এবং তাঁরই কাছে আমাকে ফিরে যেতে হবে।*

৪২. এ আয়াতের পটভূমি হচ্ছে, সাধারণ মূর্খ ও অজ্ঞদের মতো মক্কার কাফেররাও বিশ্বাস ও কর্মের সৌন্দর্য বা কদর্যতা দেখার পরিবর্তে ধনাঢ্যতা বা দারিদ্রের দৃষ্টিতে

মানুষের মূল্য ও মর্যাদা নিরূপণ করতো। তাদের ধারণা ছিল, যারা দুনিয়ায় প্রচুর পরিমাণ আরাম আয়েশের সামগ্রী লাভ করছে তারা যতই পথভ্রষ্ট ও অসৎকর্মশীল হোক না কেন তারা আল্লাহর প্রিয়। আর অভাবী ও দারিদ্র পীড়িতরা যতই সৎ হোক না কেন তারা আল্লাহর অভিশপ্ত। এ নীতির ভিত্তিতে তারা কুরাইশ সরদারদেরকে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের গরীব সাথীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করতো এবং বলতো, আল্লাহ কার সাথে আছেন তোমরা দেখে নাও। এ ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক করে বলা হচ্ছে, রিযিক কমবেশী হবার ব্যাপারটা আল্লাহর অন্য আইনের সাথে সংশ্লিষ্ট। সেখানে অন্যান্য অসংখ্য প্রয়োজন ও কল্যাণ–অকল্যাণের প্রেক্ষিতে কাউকে বেশী ও কাউকে কম দেয়া হয়। এটা এমন কোন মানদণ্ড নয় যার ভিত্তিতে মানুষের নৈতিক ও মানসিক সৌন্দর্য ও কদর্যতার ফায়সালা করা যেতে পারে। মানুষের মধ্যে কে চিন্তা ও কর্মের সঠিক পথ অবলম্বন করেছে এবং কে ভুল পথ, কে উন্নত ও সৎগুণাবলী অর্জন করেছে এবং কে অসৎগুণাবলী—এরি ভিত্তিতে মানুষে মানুষে মর্যাদার মূল পার্থক্য নির্ণীত হয় এবং তাদের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের আসল মানদণ্ডও এটিই। কিন্তু মূর্খরা এর পরিবর্তে দেখে, কাকে ধন–দৌলত বেশী এবং কাকে কম দেয়া হয়েছে।

৪৩. এর আগে এ সূরার প্রথম রুকূ'র শেষ আয়াতে এ প্রশ্নের যে জবাব দেয়া হয়েছে তা এখানে সামনে রাখা দরকার। এখানে দ্বিতীয়বার তাদের একই আপত্তির কথা উল্লেখ করে অন্যভাবে তার জবাব দেয়া হচ্ছে।

৪৪. অর্থাৎ যে নিজেই আল্লাহর দিকে রুজু হয় না বরং তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাকে জোর করে সত্য–সঠিক পথ দেখানো আল্লাহর রীতি নয়। এ ধরনের লোকেরা সত্য–সঠিক পথ পরিত্যাগ করে উদভ্রান্তের মতো যেসব ভুল পথে ঘুরে বেড়াতে চায় আল্লাহ তাদেরকে সেই সব পথে ঘুরে বেড়াবার সুযোগ দান করেন। একজন সত্য–সন্ধানীর জন্য যেসব কার্যকারণ সত্য পথলাভের সহায়ক হয়, একজন অসত্য ও ভ্রান্ত পথ প্রত্যাশী ব্যক্তির জন্য সেগুলো বিভ্রান্তি ও গোমরাহীর কারণে পরিণত করে দেয়া হয়। উজ্জ্বল প্রদীপ তার সামনে এলেও তা তাকে পথ দেখাবার পরিবর্তে তার চোখকে অন্ধ করে দেবার কাজ করে। আল্লাহ কর্তৃক কোন ব্যক্তিকে গোমরাহ করার অর্থ এটাই।

নিদর্শন দেখতে চাওয়ার জবাবে একথা বলা নজিরবিহীন বাকশৈলীর পরিচায়ক। তারা বলছিল, কোন নিদর্শন দেখাও, তাহলে আমরা তোমার কথা বিশ্বাস করতে পারি। জবাবে বলা হয়েছে, মূর্খের দল! তোমাদের সত্য পথ না পাওয়ার আসল কারণ এ নয় যে, তোমাদের সামনে কোন নিদর্শন নেই বরং এর কারণ হচ্ছে, তোমাদের মধ্যে সত্য পথ লাভের কোন আকাংখাই নেই। নিদর্শন তো চতুরদিকে অসংখ্য ছড়িয়ে আছে। কিন্তু সেগুলোর কোনটিই তোমাদের পথপ্রদর্শকে পরিণত হয় না। কারণ আল্লাহর পথে চলার ইচ্ছাই তোমাদের নেই। এখন যদি কোন নিদর্শন আসে তাহলে তা তোমাদের জন্য কেমন করে উপকারী হতে পারে? কোন নিদর্শন দেখানো হয়নি বলে তোমরা অভিযোগ করছো। কিন্তু যারা আল্লাহর পথের সন্ধান করে ফিরছে তারা নিদর্শন দেখতে পাচ্ছে এবং নিদর্শনসমূহ দেখেই তারা সত্য পথের সন্ধান লাভ করছে।

وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ ۗ بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا ۗ أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿٣١﴾

আর কী হতো, যদি এমন কোন কুরআন নাযিল করা হতো যার শক্তিতে পাহাড় চলতে থাকতো অথবা পৃথিবী বিদীর্ণ হতো কিংবা মৃত কবর থেকে বের হয়ে কথা বলতে থাকতো?[৪৭] (এ ধরনের নিদর্শন দেখিয়ে দেয়া তেমন কঠিন কাজ নয়) বরং সমস্ত ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই হাতে কেন্দ্রীভূত।[৪৮] তাহলে ঈমানদাররা কি (এখনো পর্যন্ত কাফেরদের চাওয়ার জবাবে কোন নিদর্শন প্রকাশের আশায় বসে আছে এবং তারা একথা জেনে) হতাশ হয়ে যায়নি যে, যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে সমগ্র মানব জাতিকে হেদায়াত দিয়ে দিতেন?[৪৯] যারা আল্লাহর সাথে কুফরীর নীতি অবলম্বন করে রেখেছে তাদের ওপর তাদের কৃতকর্মের দরুন কোন না কোন বিপর্যয় আসতেই থাকে অথবা তাদের ঘরের কাছেই কোথাও তা অবতীর্ণ হয়। এ ধারাবাহিকতা চলতেই থাকবে যে পর্যন্ত না আল্লাহর ওয়াদা পূর্ণ হয়ে যায়। অবশ্যি আল্লাহ নিজের ওয়াদার ব্যতিক্রম করেন না।

৪৫. অর্থাৎ তারা যে নিদর্শন চাচ্ছে তেমনি কোন নিদর্শন ছাড়াই।

৪৬. অর্থাৎ তাঁর বন্দেগী থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আছে। তাঁর গুণাবলী, ক্ষমতা ও অধিকারে অন্যদেরকে তাঁর সাথে শরীক করছে। তাঁর দানের জন্য অন্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

৪৭. এ আয়াতটির অর্থ উপলব্ধি করার জন্য লক্ষ রাখতে হবে যে, এখানে কাফেরদেরকে নয় বরং মুসলমানদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। মুসলমানরা কাফেরদের পক্ষ থেকে বার বার এসব নিদর্শন দেখাবার দাবী শুনতো। ফলে তাদের মন অস্থির হয়ে উঠতো। তারা মনে করতো, আহা, যদি এদেরকে এমন কোন নিদর্শন দেখিয়ে দেয়া হতো যার ফলে এরা মেনে নিতো, তাহলে কতই না ভালো হতো! তারপর যখন তারা অনুভব করতো, এ ধরনের কোন নিদর্শন না আসার কারণে কাফেররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত সম্পর্কে লোকদের মনে সন্দেহ সৃষ্টির সুযোগ পাচ্ছে তখন তাদের এ অস্থিরতা আরো বেড়ে যেতো। তাই মুসলমানদেরকে বলা হচ্ছে, যদি কুরআনের কোন

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ
أَخَذْتُهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿٣٢﴾ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ
بِمَا كَسَبَتْ ۗ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ ۚ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا
لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَم بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ ۗ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا
مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾
لَّهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ ۖ وَمَا لَهُم
مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ ﴿٣٤﴾

৫ রুকূ'

তোমার আগেও অনেক রসূলকে বিদ্রূপ করা হয়েছে। কিন্তু আমি সবসময় অমান্যকারীদেরকে ঢিল দিয়ে এসেছি এবং শেষ পর্যন্ত তাদেরকে পাকড়াও করেছি। তাহলে দেখো আমার শাস্তি কেমন কঠোর ছিল।

তবে কি যিনি প্রত্যেক ব্যক্তির উপার্জনের প্রতি নজর রাখেন[৫০] (তাঁর মোকাবিলায় এ দুঃসাহস করা হচ্ছে যে)[৫১] লোকেরা তাঁর কিছু শরীক ঠিক করে রেখেছে? হে নবী! এদেরকে বলো, (যদি তারা সত্যিই আল্লাহর বানানো শরীক হয়ে থাকে তাহলে) তাদের পরিচয় দাও, তারা কারা? না কি তোমরা আল্লাহকে এমন একটি নতুন খবর দিচ্ছো যার অস্তিত্ব পৃথিবীতে তাঁর অজানাই রয়ে গেছে? অথবা তোমরা এমনি যা মুখে আসে বলে দাও?[৫২] আসলে যারা সত্যের দাওয়াত মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তাদের জন্য তাদের প্রতারণাসমূহকে[৫৩] সুসজ্জিত করে দেয়া হয়েছে এবং তাদেরকে সত্য-সঠিক পথ থেকে নিবৃত্ত করা হয়েছে।[৫৪] তারপর আল্লাহ যাকে গোমরাহীতে লিপ্ত করেন তাকে পথ দেখাবার কেউ নেই। এ ধরনের লোকদের জন্য দুনিয়ার জীবনেই রয়েছে আযাব এবং আখেরাতের আযাব এর চেয়েও বেশী কঠিন। তাদেরকে আল্লাহর হাত থেকে বাঁচাবার কেউ নেই।

সূরার সাথে এমন ধরনের নিদর্শনাদি অকস্মাত দেখিয়ে দেয়া হতো তাহলে কি তোমরা মনে করো যে, সত্যিই এরা ঈমান আনতো? তোমরা কি এদের সম্পর্কে এ সুধারণা পোষণ করো যে, এরা সত্য গ্রহণের জন্য একেবারে তৈরী হয়ে বসে আছে, শুধুমাত্র

একটি নিদর্শন দেখিয়ে দেবার কাজ বাকি রয়ে গেছে? যারা কুরআনের শিক্ষাবলীতে, বিশ্ব-জগতের নিদর্শনসমূহের মধ্যে, নবীর পবিত্র-পরিচ্ছন্ন জীবনে, সাহাবায়ে কেরামের বিপ্লবমুখর জীবনধারায় কোন সত্যের আলো দেখতে পাচ্ছে না, তোমরা কি মনে করো তারা পাহাড়ের গতিশীল হওয়া, মাটি ফেটে চৌচির হয়ে যাওয়া এবং কবর থেকে মৃতদের বের হয়ে আসার মত অলৌকিক ঘটনাবলীতে কোন আলোর সন্ধান পাবে?

৪৮. নিদর্শনসমূহ না দেখাবার আসল কারণ এ নয় যে, আল্লাহর এগুলো দেখাবার শক্তি নেই বরং আসল কারণ হচ্ছে, এ পদ্ধতিকে কাজে লাগানো আল্লাহর উদ্দেশ্য বিরোধী। কারণ আসল উদ্দেশ্য হেদায়াত লাভ করা, নবীর নবুওয়াতের স্বীকৃতি আদায় করা নয়। আর চিন্তা ও অন্তরদৃষ্টির সংশোধন ছাড়া হেদায়াত লাভ সম্ভব নয়।

৪৯. জ্ঞান ও উপলব্ধি ছাড়া নিছক একটি অসচেতন ঈমানই যদি উদ্দেশ্য হতো তাহলে এ জন্য নিদর্শনাদি দেখাবার কষ্টের কি প্রয়োজন ছিল? আল্লাহ সমস্ত মানুষকে মুসলমান হিসেবে পয়দা করে দিলেই তো এ উদ্দেশ্য সফল হতে পারতো।

৫০. অর্থাৎ যিনি ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকটি লোকের অবস্থা জানেন। কোন সৎলোকের সৎকাজ এবং অসৎলোকের অসৎকাজ যার দৃষ্টির আড়ালে নেই।

৫১. দুঃসাহস হচ্ছে এই যে, তাঁর সমকক্ষ ও প্রতিপক্ষ দাঁড় করানো হচ্ছে, তাঁর সত্তা, গুণাবলী ও অধিকারে তাঁর সৃষ্টিকে শরীক করা হচ্ছে এবং তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধীনে অবস্থান করে লোকেরা মনে করছে আমরা যা ইচ্ছা—করবো, আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করার কেউ নেই।

৫২. অর্থাৎ তোমরা যে তাঁর শরীক দাঁড় করাচ্ছো এ ব্যাপারে তিন ধরনের অবস্থা সম্ভবপরঃ

এক ঃ আল্লাহ কোন নির্দিষ্ট সত্তাকে তাঁর গুণাবলী, ক্ষমতা বা অধিকারে শরীক গণ্য করেছেন বলে তোমাদের কাছে কোন প্রামাণ্য ঘোষণা এসেছে কি? যদি এসে থাকে তাহলে মেহেরবানী করে বলো তারা কারা এবং তাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করার সংবাদ তোমরা পেয়েছো কিসের মাধ্যমে?

দুই ঃ আল্লাহ নিজেই জানেন না পৃথিবীতে কিছু সত্তা তাঁর অংশীদার হয়ে গেছে এবং এখন তোমরা তাঁকে এ খবর দিতে যাচ্ছো যদি এ ব্যাপারই হয়ে থাকে তাহলে স্পষ্টভাবে নিজেদের এ ভূমিকার কথা স্বীকার করো। তারপর দুনিয়ায় কতজন নির্বোধ তোমাদের এ উদ্ভট মতবাদের অনুসারী থাকে তা আমিও দেখে নেবো।

তিন ঃ কিন্তু যদি এ দু'টি অবস্থার কোনটি সম্ভবপর না হয়ে থাকে তাহলে তৃতীয় যে অবস্থাটি থাকে সেটি হচ্ছে এই যে, কোন প্রকার যুক্তি প্রমাণ ছাড়াই তোমরা যাকে ইচ্ছা তাকেই আল্লাহর আত্মীয় মনে করে নাও, যাকে ইচ্ছা তাকেই পরম দাতা ও ফরিয়াদ শ্রবণকারী গণ্য করো এবং যার সম্পর্কে ইচ্ছা দাবী করে দাও যে, অমুক এলাকার রাজা অমুক সাহেব এবং অমুক কাজটি অমুক সাহেবের সাহায্য-সহায়তায় সম্পন্ন হয়।

৫৩. এ শিরককে প্রতারণা বলার একটি কারণ হচ্ছে এই যে, আসলে যেসব নক্ষত্র, ফেরেশতা, আত্মা বা মহামানবকে আল্লাহর গুণাবলী ও ক্ষমতার অধিকারী গণ্য করা হয়েছে

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۖ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا ۚ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوا ۖ وَّعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ﴿٣٥﴾ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ۖ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ ۚ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ ﴿٣٦﴾ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ۚ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ ﴿٣٧﴾

যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে তার অবস্থা হচ্ছে এই যে, তার পাদদেশে নদী প্রবাহিত হচ্ছে, তার ফলসমূহ চিরস্থায়ী এবং তার ছায়ার বিনাশ নেই।' এ হচ্ছে মুত্তাকীদের পরিণাম। অন্যদিকে সত্য অমান্যকারীদের পরিণাম হচ্ছে জাহান্নামের আগুন।

হে নবী! যাদেরকে আমি আগে কিতাব দিয়েছিলাম তারা তোমার প্রতি আমি যে কিতাব নাযিল করেছি তাতে আনন্দিত। আর বিভিন্ন দলে এমন কিছু লোক আছে যারা এর কোন কোন কথা মানে না। তুমি পরিষ্কার বলে দাও, "আমাকে তো শুধুমাত্র আল্লাহর বন্দেগী করার হুকুম দেয়া হয়েছে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। কাজেই আমি তাঁরই দিকে আহবান জানাচ্ছি এবং তাঁরই কাছে আমার প্রত্যাবর্তন।"[৫৫] এ হেদায়াতের সাথে আমি এ আরবী ফরমান তোমার প্রতি নাযিল করেছি। এখন তোমার কাছে যে জ্ঞান এসে গেছে তা সত্ত্বেও যদি তুমি লোকদের খেয়াল খুশীর তাবেদারী করো তাহলে আল্লাহর মোকাবিলায় তোমার কোন সহায়ও থাকবে না, আর কেউ তাঁর পাকড়াও থেকেও তোমাকে বাঁচাতে পারবে না।

এবং যাদেরকে আল্লাহর বিশেষ অধিকারে শরীক করা হয়েছে, তাদের কেউই কখনো এসব গুণ, অধিকার ও ক্ষমতার দাবী করেনি এবং কখনো লোকদেরকে এ শিক্ষা দেয়নি যে, তোমরা আমাদের সামনে পূজা-অর্চনার অনুষ্ঠানাদি পালন করো, আমরা তোমাদের আকাংখা পূর্ণ করে দেবো। কিছু ধূর্ত লোক সাধারণ মানুষের ওপর নিজেদের প্রভুত্বের দাপট

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ
لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾ يَمْحُوا
اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴿٣٩﴾ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ
الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴿٤٠﴾

৬ রুকূ'

তোমার আগেও আমি অনেক রসূল পাঠিয়েছি এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান সন্ততি দিয়েছি।[৫৬] আর আল্লাহর অনুমতি ছাড়া নিজেই কোন নিদর্শন এনে দেখাবার শক্তি কোন রসূলেরও ছিল না।[৫৭] প্রত্যেক যুগের জন্য একটি কিতাব রয়েছে। আল্লাহ যা চান নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং যা চান কায়েম রাখেন। উম্মুল কিতাব তাঁর কাছেই আছে।[৫৮]

হে নবী! আমি এদেরকে যে অশুভ পরিণামের ভয় দেখাচ্ছি চাই তার কোন অংশ আমি তোমার জীবিতাবস্থায় তোমাকে দেখিয়ে দেই অথবা তা প্রকাশ হবার আগেই তোমাকে উঠিয়ে নিই—সর্বাবস্থায় তোমার কাজই হবে শুধুমাত্র পয়গাম পৌঁছিয়ে দেয়া আর হিসেব নেয়া হলো আমার কাজ।[৫৯]

চালাবার এবং তাদের উপার্জনে অংশ নেবার উদ্দেশ্যে কিছু বানোয়াট ইলাহ তৈরী করে নিয়েছে। লোকদেরকে তাদের ভক্তশ্রেণীতে পরিণত করেছে এবং নিজেদেরকে কোন না কোনভাবে তাদের প্রতিনিধি হিসেবে দাঁড় করিয়ে আপন আপন স্বার্থোদ্ধারের কাজ শুরু করে দিয়েছে।

শিরককে প্রতারণা বলার দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে এই যে, আসলে এটি একটি আত্মপ্রতারণা এবং এমন একটি গোপন দরজা যেখান দিয়ে মানুষ বৈষয়িক স্বার্থ–পূজা, নৈতিক বিধিনিষেধ থেকে বাঁচা এবং দায়িত্বহীন জীবন যাপন করার জন্য পলায়নের পথ বের করে।

তৃতীয় যে কারণটির ভিত্তিতে মুশরিকদের কর্মপদ্ধতিকে প্রতারণা বলা হয়েছে তা পরে আসছে।

৫৪. মানুষ যখন একটি জিনিসের মোকাবিলায় অন্য একটি জিনিস গ্রহণ করে তখন মানসিকভাবে নিজেকে নিশ্চিন্ত করার এবং নিজের নির্ভুলতা ও সঠিক পথ অবলম্বনের ব্যাপারে লোকদেরকে নিশ্চয়তা দান করার জন্য নিজের গৃহীত জিনিসকে সকল প্রকার যুক্তি–প্রমাণ পেশ করে সঠিক প্রমাণ করার চেষ্টা করে এবং নিজের প্রত্যাখ্যাত জিনিসটির বিরুদ্ধে সব রকম যুক্তি–প্রমাণ পেশ করতে থাকে। এটাই মানুষের প্রকৃতি। এ কারণে

বলা হয়েছে ঃ যখন তারা সত্যের আহবান মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তখন প্রকৃতির আইন অনুযায়ী তাদের জন্য তাদের পথভ্রষ্টতাকে এবং এ পথভ্রষ্টতার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য তাদের প্রতারণাকে সুদৃশ্য ও সুসজ্জিত করে দেয়া হয়েছে এবং এ প্রাকৃতিক রীতি অনুযায়ী তাদের সত্য সঠিক পথে আসা থেকে বিরত রাখা হয়েছে।

৫৫. এ সময় বিরোধীদের পক্ষ থেকে যে একটি বিশেষ কথা বলা হচ্ছিল এটি তার জবাব। তারা বলতো, এ ব্যক্তি নিজের দাবী অনুযায়ী যদি সত্যিসত্যিই সেই একই শিক্ষা নিয়ে এসে থাকেন যা ইতিপূর্বেকার সকল নবী এনেছিলেন, তাহলে আগের নবীদের অনুসারী ইহুদী ও খৃষ্টানরা অগ্রবর্তী হয়ে এঁকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে না কেন? এর জবাবে বলা হচ্ছে, তাদের মধ্য থেকে কেউ এতে খুশী এবং কেউ অখুশী, কিন্তু হে নবী! কেউ খুশী হোক বা অখুশী, তুমি পরিষ্কার বলে দাও, আমাকে তো আল্লাহর পক্ষ থেকে এ শিক্ষা দান করা হয়েছে এবং আমি সর্বাবস্থায় এর অনুসারী থাকবো।

৫৬. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যেসব আপত্তি উত্থাপন করা হতো এটি তার মধ্য থেকে আর একটি আপত্তির জবাব। তারা বলতো, এ আবার কেমন নবী, যার স্ত্রী–সন্তানাদিও আছে! নবী–রসূলদের যৌন কামনার সাথে কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না কি?

৫৭. এটিও একটি আপত্তির জবাব। বিরোধীরা বলতো, মূসা 'সূর্য করোজ্জ্বল হাত' ও 'লাঠি' এনেছিলেন, ঈসা মসীহ অন্ধদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতেন এবং কুষ্ঠরোগীদেরকে রোগমুক্ত করতে পারতেন। সালেহ উটনীর নিদর্শন দেখিয়েছিলেন। তুমি কি নিদর্শন নিয়ে এসেছো? এর জবাবে বলা হয়েছে, যে নবী যে জিনিসই দেখিয়েছেন নিজের ক্ষমতা বা শক্তির জোরে দেখাননি। আল্লাহ যে সময় যার মাধ্যমে যে জিনিস প্রকাশ করা সংগত মনে করেছেন তা প্রকাশিত হয়েছে। এখন যদি আল্লাহ প্রয়োজন মনে করেন তাহলে যা তিনি চাইবেন দেখাবেন। নবী নিজে কখনো এমন খোদায়ী ক্ষমতার দাবী করেননি যার ভিত্তিতে তোমরা তাঁর কাছে নিদর্শন দেখাবার দাবী করতে পারো।

৫৮. এটিও বিরোধীদের একটি আপত্তির জবাব। তারা বলতো, ইতিপূর্বে যেসব কিতাব এসেছে সেগুলোর উপস্থিতিতে আবার নতুন কিতাবের কি প্রয়োজন ছিল? তুমি বলছো, সেগুলো বিকৃত হয়ে গেছে, এখন সেগুলো নাকচ করে দেয়া হয়েছে এবং তার পরিবর্তে এ নতুন কিতাবের অনুসারী হবার হুকুম দেয়া হয়েছে। কিন্তু আল্লাহর কিতাব কেমন করে বিকৃত হতে পারে? আল্লাহ তার হেফাজত করেননি কেন? আর আল্লাহর কিতাব কেমন করে নাকচ হতে পারে? তুমি বলছো, এটি সেই আল্লাহর কিতাব যিনি তাওরাত ও ইঞ্জীল নাযিল করেছিলেন। কিন্তু এ কি ব্যাপার, তোমার কোন কোন পদ্ধতি দেখছি তাওরাতের বিধানের বিরোধী? যেমন কোন কোন জিনিস তাওরাত হারাম ঘোষণা করেছে কিন্তু তুমি সেগুলো হালাল মনে করে খাও। এসব আপত্তির জবাব পরবর্তী সূরাগুলোয় বেশী বিস্তারিত আকারে দেয়া হয়েছে। এখানে এগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণাংগ জবাব দিয়ে শেষ করে দেয়া হয়েছে।

"উম্মুল কিতাব" মানে আসল কিতাব অর্থাৎ এমন উৎসমূল যা থেকে সমস্ত আসমানী কিতাব উৎসারিত হয়েছে।

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٤١﴾ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا ۖ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ۗ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٤٢﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا ۚ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴿٤٣﴾

এরা কি দেখে না আমি এ ভূখণ্ডের ওপর এগিয়ে চলছি এবং এর গণ্ডী চতুরদিক থেকে সংকুচিত করে আনছি?[৬০] আল্লাহ রাজত্ব করছেন, তাঁর সিদ্ধান্ত পুনরবিবেচনা করার কেউ নেই এবং তাঁর হিসেব নিতে একটুও দেরী হয় না। এদের আগে যারা অতিক্রান্ত হয়েছে তারাও বড় বড় চক্রান্ত করেছিল[৬১] কিন্তু আসল সিদ্ধান্তকর কৌশল তো পুরোপুরি আল্লাহর হাতে রয়েছে। তিনি জানেন কে কি উপার্জন করছে এবং শীঘ্রই এ সত্য অস্বীকারকারীরা দেখে নেবে কার পরিণাম ভালো হয়।

এ অস্বীকারকারীরা বলে, তুমি আল্লাহর প্রেরিত নও। বলো, "আমার ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহর সাক্ষ যথেষ্ট এবং তারপর আসমানী কিতাবের জ্ঞান রাখে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির সাক্ষ।"[৬২]

৫৯. অর্থ হচ্ছে, যারা তোমার এ সত্যের দাওয়াতকে মিথ্যা বলেছে তাদের পরিণাম কি হয় এবং কবে তা প্রকাশ হয় তা চিন্তা করার প্রয়োজন তোমার নেই। তোমার ওপর যে কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে পূর্ণ একাগ্রতার সাথে তা পালন করে যেতে থাকো এবং ফায়সালা আমার হাতে ছেড়ে দাও। এখানে বাহ্যত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হলেও মূলত তাঁর বিরোধীদেরকে শুনানোই উদ্দেশ্য। তারা চ্যালেঞ্জের ভংগিতে বার বার তাঁকে বলতো, তুমি আমাদের যে বিপর্যয় ও ধ্বংসের হুমকি দিয়ে আসছো তা আসছে না কেন?

৬০. অর্থাৎ তোমার বিরোধীরা কি দেখছে না ইসলামের প্রভাব আরব ভূখণ্ডের সর্বত্র দিনের পর দিন ছড়িয়ে পড়ছে? চতুরদিক থেকে তার বেষ্টনী সংকীর্ণতর হয়ে আসছে? এটা এদের বিপর্যয়ের আলামত নয় তো আবার কি?

"আমি এ ভূখণ্ডে এগিয়ে চলছি"—আল্লাহর একথা বলার একটি সূক্ষ্ম তাৎপর্য রয়েছে। যেহেতু হকের দাওয়াত আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় এবং এ দাওয়াত যারা পেশ করে আল্লাহ

তাদের সাথে থাকেন, তাই কোন দেশে এ দাওয়াত ছড়িয়ে পড়াকে আল্লাহ এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নিজেই ঐ দেশে এগিয়ে চলছেন।

৬১. সত্যের কন্ঠ রুদ্ধ করার জন্য মিথ্যা, প্রতারণা ও জুলুমের অস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে, এটা আজ কোন নতুন কথা নয়। অতীতে বারবার এমনি ধরনের কৌশল অবলম্বন করে সত্যের দাওয়াতকে পরাস্ত করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে।

৬২. অর্থাৎ আসমানী কিতাবের জ্ঞান রাখে এমন প্রত্যেক ব্যক্তি একথার সাক্ষ দেবে যে, যাকিছু আমি পেশ করছি তা ইতিপূর্বে আগত নবীগণের শিক্ষার পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।